দৈনিক বাংলা

0 074

তারিখ ... ২৪.২.৮৫ ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম 7 ...

পরীক্ষায় এখন ফেলের জোয়ার

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএ, বিকম ও বিএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। বিএ পরীক্ষার পাসের হার শতকরা ১৭ এবং বিকম বিএসসি পরীক্ষার পাসের হার যথাক্রমে শতকরা ১৯ ও ২১ ভাগ। এ খবরের সাথে চমকপ্রদ অনেক খবর আছে। অনেক কলেজের পাসের হার শূন্য। মানে কেউ পাস করতে পারেনি। এর মধ্যে সরকারী কলেজও আছে। এ খবরে হয়তো নতুনত্ব কিছু নেই। স্বাধীনতার পর পাস-ফেলের চড়াই-উৎরাই বহু দেখেছি। শতকরা প্রায় একশ ভাগ পাস করার রেকর্ডও আছে আবার দশকের নীচের অংকের পাসের হারের নজিরও যে নেই তা নয়।

অন্যান্য বছরের মতো এ বছরও পাসের হার তথৈবচ। খবরটাকে একটু ঘুরিয়ে বললে বলা যায়, ফেলের হারই বেশী। বিএতে শতকরা ৮৩ ভাগ ফেল। বিকম পরীক্ষায় ফেলের হার ৮১ এবং বিএসসিতে এই হার শতকরা ৭৯। স্বাধীনতার পর দু একটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সব বছরই ফেলের হার আশংকাজনক। পরীক্ষায় পাস-ফেল থাকে। যেমন থাকে খেলাধুলায় হার-জিতের পালা। সুতরাং ফেল নিয়ে বেশী কিছু বলার থাকে না। কিন্তু যখন সংখ্যাতাত্ত্বিক বিচারে ফেলের হারটা অস্বাভাবিক মনে হয়। ঝাঁকে ঝাঁকে ছাত্র ফেল করতে থাকে, তখন প্রশ্ন জাগে, কেন এমন হয়? আর যখন বছরের পর বছর এই অবস্থা চলতে থাকে, কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় না, তখন শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে কথা ওঠা স্বাভাবিক।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে শিক্ষামানের যে কোন পরিবর্তন ঘটেনি, সে কথা বলা যায় না। তবে শিক্ষাক্ষেত্রে এই গুণগত পরিবর্তনের কারণ অনেক। আর সে পরিবর্তন ধনাত্মক কি ঋণাত্মক—সে বিতর্কে না গিয়েও শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবর্তিত পরিবেশকে আঁচ করা যায়। তবে সবক্ষেত্রে যে শিক্ষামানের অবনতি হয়েছে, তাও বলা যায় না।

আজকের প্রসঙ্গ পাস-ফেল নিয়ে। খেলার মাঠে খেলাকে যতটা সহজে খেলোয়াড় সুলভ মেজাজে নেয়া যায়, পরীক্ষায় অকৃতকার্যতা তেমন ভাবে নেয়া যায় না। কারণ একজন পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষার হলে পরীক্ষার খাতা নিয়ে বসতে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়। এর সঙ্গে সময়ের প্রশ্ন আছে। জড়িত আছে স্বল্প আয়ের পিতা-মাতার কায়-ক্লেশে খরচ যোগানোর কাহিনী। যে দেশের শতকরা ৬০ ভাগ ছেলেমেয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় অতিক্রম করার আগেই অর্থাভাবে শিক্ষা জীবনে ইতি টানতে বাধ্য হয়, সে দেশে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক বা স্নাতক পর্যায়ে একজন অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীর খেসারত কত এবং পরিবারে এই খেসারতের প্রভাব কতখানি—তা আর বুঝিয়ে বলার দরকার পড়ে না।

ফেল করা ছাত্রছাত্রীদের সাফাই গাওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। একজন অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীর দুরাবস্থা তুলে ধরা এবং জাতীয় জীবনে এর প্রভাব কতখানি, সেটুকু বোঝানোর চেষ্টা করাই মূল কথা। অনেকে বলতে পারেন, খারাপ ছাত্রছাত্রীরা তো অকৃতকার্য হবেই। আমরাও এ ব্যাপারে একমত। কিন্তু যখন অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীর সংখ্যা পাসের মোট সংখ্যার ৮/৯ গুণ হয়, তখন শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিবে নাকি? সামগ্রিকভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন জাগে নাকি? তখন বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়ে যে ফেল করা ছাত্রছাত্রীরা পাস করার আদৌ যোগ্য ছিলো না। অথবা ছাত্রছাত্রীদের গড়পড়তা মেধা দারুণ ভাবে হ্রাস পেয়ে গেছে। তা হলে ব্যাপারটা কি? গলদ আসলে কোথায়?

গলদ নিশ্চয়ই আছে। আর এ গলদকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা প্রয়োজন। মনে রাখা দরকার যে অকৃতকার্যতার কারণে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী যদি এ ভাবে বছর বছর শিক্ষার সামাজিক স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত হয় তবে তার আর্থ-সামাজিক প্রভাব সুদূরপ্রসারী ও মারাত্মক। কি পারিবারিক জীবনে কি সামাজিক জীবনে এর দুর্বিষহ পরিণতি বিদ্যমান। কোন পরিবারের কেউ পরীক্ষায় খারাপ করলে টাকা-পয়সার খেসারত তো আছেই, উপরোক্ত হতাশা ও নিরানন্দ এসে বাসা বাধে সেখানে।

মাধ্যমিক পরীক্ষার কথাই ধরা যাক। কোন পরীক্ষার্থীকে মাধ্যমিক পরীক্ষা পর্যন্ত ধাপে ধাপে অর্থনীতির ভাষায় বিস্তর টাকা-পয়সা বিনিয়োগ করতে হয়। আর ব্যয় করতে হয় কৈশোরের মূল্যবান দশ/এগারটি বছর। মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত পরিবারের এই পরীক্ষার্থী ভালোয় ভালোয় উত্তীর্ণ হলে হয়তো পিতা-মাতা রঙ্গিন স্বপ্নে বিভোর হতে পারেন। আর যদি অকৃতকার্য হয়, তাহলে গরীব পিতা-মাতা চোখে সর্ষে ফুলই দেখেন।

উচ্চ মাধ্যমিক বা স্নাতক পর্যায়ে অকৃতকার্য হলে পূর্ববর্তী সার্টিফিকেটগুলো দিয়ে জীবন সংগ্রামে নামা চলে। কিন্তু মাধ্যমিক স্তরে বার বার অকৃতকার্য হলে সে পথও রুদ্ধ হয়ে যায়।

আমাদের দেশের শতকরা নব্বই ভাগ লোকের বাস গ্রামে। গ্রামে স্কুল কলেজ থাকলেও ভালো শিক্ষার পরিবেশ প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভালো শিক্ষক, লাইব্রেরী ও পর্যাপ্ত শিক্ষা সরঞ্জাম নেই। ফলে গ্রামীণ নিম্নবিত্ত বা মধ্যবিত্ত পরিবারের ছাত্রছাত্রীরাই দুর্দশার সম্মুখীন হয় সবচেয়ে বেশী। ফেলের আনুপাতিক হার সংখ্যাতাত্ত্বিক বিচারে মফস্বলেই বেশী। আর আমাদের বিদ্যার্জনের মহিমা এমন যে কৃতকার্য কিংবা অকৃতকার্য—যেটাই হই না কেন, খুব কম ক্ষেত্রেই আমরা পিতার সাথে মাঠে কিংবা পিতৃ-পুরুষের পেশায় ফিরে যেতে পারি। আমার মনে হয় শিক্ষাকে আরও প্রায়োগিক ও জীবন সম্পৃক্ত করে এ অবস্থার অবসান ঘটানো যেতে পারে। এক্ষেত্রে মাধ্যমিক স্তরে শহরের জন্য আলাদা বিকল্প রেখে শিক্ষাকে প্রয়োজন মতো কৃষি বা পিতা-মাতার নিজস্ব পেশার সাথে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। এতে করে কৃতকার্যরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবে এবং অকৃতকার্যরা পিতৃপুরুষের পেশায় ফিরে যেতে লজ্জা বোধ করবে না। ফলে একদিকে উৎপাদনের মৌল স্তরে রুগ্ন উত্তরাধিকার ধীরে ধীরে অপসারিত হবে। বেকারত্বের মতো সামাজিক জটিলতাও হ্রাস পাবে। আমার এক বন্ধু এই সমস্যাটিকে একটু রসালোভাবে তুলে ধরেছেন। তার মতে এভাবে ফেল করতে থাকলে লেখাপড়াটা দাঁড়াবে পাট চাষের মত। তার কথা পরিষ্কার। অর্থাৎ অলাভজনক ও অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ। বার বার পরীক্ষা দিয়েও ফেল করতে হয়। আবার পাস করেও যখন চাকরির ধান্দায় বছরের পর বছর ঘুরতে হয়, সহজে চাকরি মিলে না, আর মিললেও যোগ্যতা অনুপাতে নয়। সে ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত পরিবারের অভিভাবক ছেলেপেলেদের লেখাপড়ার জন্য দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ভাববে বৈকি। ঠিক পাট চাষের মতো। পাটচাষী যদি তার মূলধন, শ্রম ও অর্থ খাটিয়ে যে উৎপাদন পায়, তার অর্থ মূল্য যদি বিনিয়োগকৃত অর্থের চেয়ে কম হয় বা সমান সমান হয়, তাহলে সে পাট চাষে উৎসাহ হারাতে পারে। ঠিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও এটা ভাবা যেতেই পারে। গরীব পিতা মাতার সন্তান যদি বার বার অকৃতকার্য হয় তবে সে সন্তানদের লেখা পড়ার উৎসাহ নাও দিতে পারে। বন্ধুর একদম অকাট্য যুক্তি। অর্থতত্ত্বের ছকে ছকে মিলে।

আর যাই হোক, কথাটা একদম কথার কথা নয়। সামগ্রিকভাবে আমাদের দেশের পুঁথিগত বা সার্টিফিকেট সর্বস্ব বিদ্যার কদর কমে গেছে। কর্মক্ষেত্রে সীমিত সুযোগ থাকায় বেকারত্বের বোঝা পর্বতপ্রমাণ। এ সমস্ত কারণে শিক্ষাব্যবস্থাকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করা অস্বাভাবিক কিছু নয়। শিক্ষাক্ষেত্রে সমস্যা অনেক। শিক্ষা পরিবেশের সমস্যা আছে। শিক্ষকের সমস্যা আছে। লাইব্রেরীতে বই পুস্তকের সমস্যা আছে। হলে-হোস্টেলে থাকার অসুবিধা আছে। শিক্ষার্থীর ব্যয়ভার বহনের অভিভাবকের সমর্থের প্রশ্ন জড়িত আছে। এর পরও আছে সামাজিক স্থিতিশীলতার প্রশ্ন। পরীক্ষার্থীদের মেধা ও শিক্ষামানের অবনতির ঢালাও অভিযোগ না এনে পরীক্ষায় অকৃতকার্যতার সার্বিক ব্যাপারটিকে বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিতে দেখা প্রয়োজন। এমনিতেই আমাদের দেশের শিক্ষার হার কম। শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য ও অকৃতকার্যতার বোঝা যদি দিনে দিনে বাড়তেই থাকে, তবে গোটা শিক্ষাব্যবস্থাকে ভিন্নভাবে মূল্যায়ন অসম্ভব কিছু নয়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের জাতীয় শিক্ষার নীতিনির্ধারক, সমাজবিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদদের এ নিয়ে ভাবতে হবে। এগিয়ে আসতে হবে এ সমস্যার ইতিবাচক সমাধান নিয়ে।

—দেলওয়ার হাসান